সালাফদের পরিচয় ও মানহাজ

আদিল মুরশিদ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

> وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا
>
> অর্থঃ যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস! [সূরা আন-নিসা, ১১৫]

মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষাগুলো জেনে নেয়াটা উত্তম।

হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা

• সনদ (السَّنَد): হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত যে ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে পৌঁছেছে, সেই বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ (Chain of Narrators) বলা হয়।

• রাবি (الرَّاوِي): হাদিসের সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে রাবি (Narrator) বলা হয়।

• মতন (الْمَتْنُ): হাদিসের মূল বক্তব্য বা বাণী, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

• সিক্বাহ (الثِّقَة): যে রাবি ন্যায়পরায়ণ (আদল) ও নির্ভুল স্মৃতিশক্তির অধিকারী, তাকে সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবি বলা হয়। কোনো হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য তার সনদের সকল রাবির সিক্বাহ হওয়া অপরিহার্য।

• আওসাক্ব (أَوْثَق): একাধিক সিক্বাহ রাবির মধ্যে যিনি তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য, অধিক প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বা অধিক সংরক্ষণশীল, তাকে আওসাক্ব (More Reliable) বলা হয়।

• শায (شَاذّ): যদি একই হাদিস দুইজন সিক্বাহ রাবি বর্ণনা করেন, কিন্তু তাঁদের একজন অপরজনের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য (আওসাক্ব) হন এবং তাঁর বর্ণনার বিরোধিতা করে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সিক্বাহ রাবি ভিন্ন বর্ণনা করেন, তাহলে অধিক নির্ভরযোগ্য (আওসাক্ব) রাবির বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সিক্বাহ রাবির বিরোধী বর্ণনাকে শায বলা হয়। এ ধরনের

ক্ষেত্রে শায বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়; বরং মুহাদ্দিসগণ আওসাক্ব রাবির বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেন। এ অবস্থাকে মতনের শুযূয (شذوذ المتن) বলা হয়।

নবী সাঃ বলেন-

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

অর্থঃ "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগের মানুষেরা (সাহাবীগণ), এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা (তাবেঈগণ), তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা (তাবে-তাবেঈগণ)।" [মুত্তাফাকুন আলাইহী]

এখানে একই হাদিস দুটি ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। উভয় সনদই সহীহ। একটি বর্ণনায় "ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" বাক্যাংশটি দুইবার এসেছে, যা সহীহ ও সংরক্ষিত (মাহফূয) বর্ণনা। অপর বর্ণনায় বাক্যাংশটি তিনবার এসেছে। এ বর্ণনার সনদও সহীহ; কারণ এর সকল রাবী সিকাহ। তবে এর মতন শায।

হাদিসশাস্ত্রের পরিভাষায়, কোনো সিকাহ রাবী যদি তাঁর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য (আওসাক) সিকাহ রাবীদের বর্ণনার বিপরীতে ভিন্নরূপে কোনো বর্ণনা করেন, তাহলে সেই বর্ণনাকে শায বলা হয়। এক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য সিকাহ রাবীগণ "ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" বাক্যাংশটি দুইবার বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে একজন সিকাহ রাবী সেটিকে তিনবার বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণনার সনদ সহীহ হলেও মতনটি শায বলে গণ্য হয়েছে। অতএব, উভয় সনদই সহীহ; তবে যে বর্ণনায় "ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" তিনবার এসেছে, সেটির মতন শায।

তো উল্লেখিত হাদিসের ক্ষেত্রে উভয় সনদ সহীহ হলেও হাদিসশাস্ত্রের কিতাবে 'দুই বারের' বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তো এই হাদিস হলো সালাফদের দলিল।

সালাফদের পরিচয়

'সালাফ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা প্রজন্ম'। উদাহরনস্বরূপ, আমার বড় ভাই আমার সালাফ, আমার পিতা আমার সালাফ, আমার দাদা আমার সালাফ। আর শরিয়তের পরিভাষায় 'সালাফ' বলতে বোঝায় সেই তিন প্রজন্মকে, যাদের ব্যাপারে নবী ? সত্যায়ন করেছেন। এই তিন প্রজন্মে কোনো না কোনোভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঈমানের ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ঈমানের ব্যাপারে সত্যায়ন করছেন-

اٰمِنُوۡا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاس

অর্থঃ তাদের মতো তোমরাও ঈমান আন [সূরা বাকারাহ, ১৩]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত ঈমান আনো যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমান এনেছে। সুতরাং সাহাবীরা সালাফ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহাবায়ে কিরাম হলেন সালাফের মধ্যে সর্বোত্তম কেননা আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন-

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থঃ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।

[সূরা বায়্যিনাহ, সূরা আত-তাওবা]

যেমন: আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী (রা.) এবং অন্যান্য সকল সাহাবীগণ। এরপরের প্রজন্ম, অর্থাৎ সাহাবীরা যাদের (তাবেঈ) ঈমানের ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন তারাও সালাফ। যেমন, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, হাসান বসরী রাহিমাহুমুল্লাহ। এর পরের প্রজন্ম, তাবেঈরা যাদের (তাবে-তাবেঈগণ) ঈমানের ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন তারাও সালাফ। মূলত এরা হলেন সালাফদের তিন প্রজন্ম।

সালাফ এবং সালাফদের যুগ (প্রজন্ম)

হাদিসে বর্নিত 'قرن' (কুরুন/প্রজন্ম) শব্দটির একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো- সর্বশেষ সাহাবি যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন, ততক্ষণ তা সাহাবি যুগ বলে গণ্য কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ 'মিনহাজুস সুন্নাহ'য় এই ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করেছেন। মূলত এটাতে রাফেযীদের খণ্ডন করে ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ লিখছেন। আরেকটি কিতাব আছে নাসারাদের খণ্ডন করে, সেটা হলো 'আল জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসিহ (যাঁরা ঈসা (আ.)-এর ধর্মকে বিকৃত করেছে, তাদের প্রতি সঠিক উত্তর)'।

তার অধিকাংশ কিতাবেই দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে যেসব ফিরকা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন। আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যিন, আর-রাদ্দু আলাল মাতুরিদি, আর-রাদ্দু আলাল আশ'আরি, আর-রাদ্দু আলাল কালামি এভাবে চার খন্ডের কিতাব, 'আল মাওক্বিফ ইবনে তাইমিয়া আলা আল আশাআরি (৪ খন্ডের), 'আল ফতোয়া আল হামাউয়্যিয়া' আল কুবরা ও আস-সুগরা ইত্যাদি হলো তার লিখিত কিতাব। দারু ইবনু হাজম থেকে তার ৩৭ খণ্ডের মাজমু' আল ফাতওয়া বের হয়েছে। এর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে তিনি আশআরিদের ব্যাপারে খণ্ডন করে লিখছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আশআরিদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমার তলে ঐক্যবদ্ধ করা। এরা উম্মতের ৭৩ ফিরকার অন্তর্ভূক্ত কিনা সেটা ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু তাদেরকে বের করে দেওয়া উদ্দেশ্য না। এটা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর নিজের কথা।

এটা হলো ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মৌলিক মানহাজ। তিনি যতটা না ইসলাম বিরোধীদের খণ্ডন করছেন, তার চেয়ে বেশি খণ্ডন করছেন ইসলামের মধ্যে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ফিরকার ব্যাপারে। ওয়ায়েল বি. হাল্লাক তার 'রিফর্মিং মডার্নিটি' বইয়ে বলেছেন, ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ একটি মানহাজে বিশ্বাস করতেন, সেটা হলো নতুন লোককে ইসলামে প্রবেশ করানোর চেয়ে যারা ইতিমধ্যেই ইসলামে আছে তাদের পরিশুদ্ধি বেশি জরুরি। অর্থাৎ তিনি মূল জিনিসটা এভাবে ব্যাখ্যা দিতেন যে, মুনাফা অর্জনের চেয়ে মূলধন রক্ষা করা বেশি জরুরি। তাই তার কিতাবগুলোতে বাইরের ফিরকাগুলোর চেয়ে ইসলামের মধ্যে গজিয়ে ওঠা বাতিল

ফিরকাকে খণ্ডন করে তিনি বেশি লিখেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি.) বলেন- “প্রজন্ম বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, সাহাবারা বেঁচে থাকাবস্থায় যতক্ষণ তারা তাবেঈদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এবং তাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ সাহাবি যুগ। যখনই সাহাবারা সংখ্যালঘু হয়ে গেছেন বা তাদের প্রভাব কমে গেছে, তখনই তাবেঈ যুগ শুরু হয়ে গেছে তা সাহাবি বেঁচে থাকুন বা না থাকুন।”

অনেকে একটা কথা বলেন যে সাহাবীরা বেঁচে থাকতে কিভাবে ফিতনা হয়েছিল? আসলে বক্তব্যটি সঠিক না। সাহাবীরা বেঁচে আছেন মানে হলো সালাফ (সাহাবী) বেঁচে আছেন কিন্তু তখন আসলে তাবেঈদের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলিফা হিসেবে বাইয়াত পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব সার্বজনীন ছিল না। ওই সময় যুগটি তাবেঈ যুগে চলে গিয়েছিল যদিও তিনি সাহাবি ছিলেন।

তাই, একজন সাহাবি বেঁচে থাকা মানেই সাহাবি যুগ নয়; বরং সাহাবাদের সামগ্রিক প্রভাব ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর যুগ নির্ধারণ নির্ভর করে। সালাফদের তিনটি যুগ বা প্রজন্ম হল সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ- এই তিনটি যুগই 'সালাফি যুগ'। সর্বশেষ সালাফি যুগ হলো তাবে-তাবেঈদের যুগ।

• সাহাবি যুগ: সাহাবারা তাবেঈদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও তাদের প্রভাব বিদ্যমান

• তাবেঈ যুগ: তাবেঈরা তাবে-তাবেঈদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ও তাদের প্রভাব বিদ্যমান

• তাবে-তাবেঈ যুগ: এই যুগই সর্বশেষ সালাফি যুগ। তাবে-তাবেঈ যুগের সীমানা এটা নয় যে 'সর্বশেষ তাবে-তাবেঈ যতক্ষণ বেঁচে আছেন'। বরং তাবে-তাবেঈরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের উপর যতক্ষণ প্রভাবশালী আছেন, ততক্ষণই সেই যুগ।

সালাফ কারা এই বিষয়ে ইমাম বুখারি ও ইবনে হাজার আসকালানী (রাহি.) আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাহাবি হওয়ার জন্য যেমন শর্ত প্রয়োজন একইসাথে তাবেঈ কিংবা তাবে-তাবেঈ হওয়ার জন্যেও শর্ত প্রয়োজন। কেউ সাহাবি কিনা তা প্রমাণের জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে।

১। নবী (সা.) নিজে থেকে বলা যে অমুক আমার সাহাবী

২। জমহুর বা দুইজন সাহাবীর সাক্ষী দিতে হবে যে "অমুক হলো সাহাবী"

৩। কোন সাহাবীর নিজে থেকে বলা যে, "আমি আল্লাহর নবীকে দেখেছি এবং আমি সাহাবী" এবং এ বিষয়ে শক্ত প্রমাণ থাকা

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতি নিয়ে “নুখবাতুল ফিকর" (نُخْبَةُ الْفِكَرِ) – এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইবনে হাজার আসকালানী (রাহি.)। একইভাবে কেউ তাবেঈ হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন কোনো সাহাবীর সাথে তার ঈমানি সম্পর্ক ছিল; ঐ সাহাবী তার ঈমান, আমল ও ইলমকে সত্যায়ন করেছেন, যার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। কেউ শুধু কোনো সাহাবীর সাথে দেখা

করেছে বলেই তাবেঈ হওয়া যাবে না যতক্ষণ না সাহাবীর সত্যায়ন প্রমাণিত হচ্ছে।

আর সালাফী যুগ অর্থাৎ 'খইরুল কুরুনি ক্বারনি', এই 'কুরুন' শব্দের অর্থ হলো প্রজন্ম। সর্বোত্তম প্রজন্ম হলো আমার প্রজন্ম অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, এরপর পরবর্তী, এরপর পরবর্তী প্রজন্ম। এই প্রজন্মের একটা ব্যাখ্যা সাধারণত আমাদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, সর্বশেষ সাহাবী বেঁচে থাকা অবধি সেটা ছিল সাহাবী যুগ। কিংবা সর্বশেষ তাবেঈ যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন সেটা তাবেঈ যুগ, এরপর তাবে-তাবেঈ যুগ। কিন্তু মিনহাজুস সুন্নাহর মধ্যে, ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এই কথাটিকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন 'করনুন' বা প্রজন্ম বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো সাহাবীরা বেঁচে থাকা অবস্থায় যতক্ষণ তারা তাবেঈদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন সেটাই সাহাবী যুগ। যখনই সাহাবীরা তাবেঈদের চেয়ে সংখ্যায় লঘু হয়ে গেছেন কিংবা সাহাবীদের প্রভাব তাবেঈদের চেয়ে কমে গেছে, সাথে সাথে সাহাবীদের সংখ্যাধিক্য থাকুক বা না থাকুক, কোনো সাহাবী বেঁচে থাকুন বা না থাকুন, সেটা তাবেঈ যুগ হয়ে গেছে।

আপনি দেখবেন যে সাহাবী যুগের অনেক সময় ফিতনার প্রসঙ্গে অনেক মুস্তাশরিকিন বা ওরিয়েন্টালিস্টরা একটা ইশকাল সৃষ্টি করে যে, সাহাবীরা থাকতে কেন তাবেঈরা ফিতনায় পড়েছেন? এটা সত্য না। সাহাবী আছে মানে সালাফ আছে। সর্বোত্তম সালাফদের মধ্যে তিনটা প্রজন্ম; সাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈন। এই তিন প্রজন্মের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সাহাবীগন এবং সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর, উমার, উসমান, আলী (রাদ্বি.)।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ যেভাবে বলছেন, অর্থাৎ সাহাবীরা সংখ্যাধিক্য আছে তাবেঈদের উপর এবং তাদের প্রভাবটা জারি আছে, যতক্ষণ এটা হচ্ছে ততক্ষণ এটা সাহাবী যুগ। উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা আমরা বলতে পারি। তিনি আমিরুল মু'মিনীন ছিলেন। তিনি খলিফা হিসেবে বায়াত নিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিমদের মাঝে তার কোন প্রভাব ছিল না। তাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হত্যা করেননি, বরং তিনি ভুলক্রমে নিজের লোকদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, এটি ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু সে সময়টি সাহাবী যুগ অতিবাহিত হয়ে তাবেঈ যুগে চলে গিয়েছিল। কেননা তখন সাহাবীদের সংখ্যা তাবেঈদের চেয়ে কম ছিল এবং তাদের প্রভাবটা কমে গিয়েছিলো।

তাই তাবেঈ যুগে চলে যাওয়া মানে সালাফী যুগ শেষ হয়ে যাওয়া না বরং সালাফ যুগটা তখনো বহাল আছে তবে সাহাবীদের যুগটা আর নেই যদিও সাহাবীরা বেঁচে আছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি তাবেঈ হওয়ার জন্য কোনো সাহাবীর সাথে যে তার ঈমানের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তার ঈমান, আমল ও ইলমকে যে সত্যায়ন করেছেন অবশ্যই সেটার প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যথায় যে কেউ নিজেকে তাবেঈ দাবি করলে হবে না। জান্নাতে যাওয়ার জন্য সালাফ হওয়া জরুরি না। মুসলিম হওয়াই যথেষ্ট। হয়। নবী সাঃ বলেন-

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি বলল 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' (এবং এর ওপর মৃত্যুবরণ করল), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অনুরূপভাবে তাবেঈদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাবে-তাবেঈনদের চেয়ে শক্তিশালী ছিলেন এবং তাদের প্রভাবটা বহাল ছিল,

ততক্ষণ সেটা তাবেঈ যুগ, যদিও সংখ্যায় তারা কমই হোন। হাদিসে এসেছে যে, নবী (সা.) বলেন-

> عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي
>
> অর্থঃ তোমরা আমার সুন্নত (আদর্শ) এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।

তিনি (সা.) আরও বলেন যে, উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক ফিরকা জাহান্নামী হবে কেবল একটি ব্যতীত। তারা হচ্ছে-

> مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي
>
> অর্থঃ যে নীতি ও আদর্শের ওপর আমি এবং আমার সাহাবিরা প্রতিষ্ঠিত আছি

আবু মনসুর আল বাগদাদি রাহি. এর এই বিষয়ে একটি কিতাব আছে, "আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক" (الفرق بين الفرق) যেখানে এই সংক্রান্ত সকল হাদিস একত্র করা হয়েছে। হাদিসটা সেখানে মুতাওয়াতির পর্যায়ে নেয়া হয়েছে। তবে মতনের মধ্যে একটু ভিন্নতা আছে। মুতাওয়াতির দুই প্রকার; একটি হলো মানাবী অপরটি লাফজি। এটি হলো মুতাওয়াতিরে মানাবী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم
>
> অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের।

শরহে আকিদাতুত ত্বহাবিয়ার মধ্যে আবুল ইজ আল হানাফি বলেন- আল্লাহ আযযা ওয়া জাল "أَطِيعُوا" – শব্দটি নিজের সাথে এবং নবী (সা.) এর সাথে যুক্ত করেছেন। কিন্তু "وَأُولِي الْأَمْرِ" – এর সাথে আনেননি। অর্থাৎ, অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের। তাদেরকে যে অনুসরণ করবে তাকে অনুসরণ করা লাজিম থাকবে।

এ ব্যাপারে আলেমদের মত হলো ইসলামের মাকসাদ হচ্ছে কেবল আল্লাহ ও নবী (সা.) এর আনুগত্য করা। আর নবী (সা.) এর আনুগত্য করা মানে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য বুঝায়। এই দুটোর মাঝে তাফরিক (পার্থক্য) করা কুফর। কোনোভাবেই এই পার্থক্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, "আমি কুরআন মানি, হাদিস মানি না" তবে নিঃসন্দেহে সে কাফির হয়ে যাবে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা না পাওয়া যায়।

তাহলে উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা পাই, নবী (সা.) এর অনুসরণ, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবাদের (রা.) অনুসরণ, প্রথম তিন প্রজন্ম তথা সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে- তাবেঈদের অনুসরন করতে হবে। তাবে-তাবেঈদের পরে 'আতবাউত তাবেঈন' নামে

একটি প্রজন্ম কেউ কেউ ধরে থাকেন তবে তাদের 'আসরুর রিওয়ায়েহ' বা হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়, অনুসরণীয় হিসেবে নয়।

তাহলে কুরআন ও হাদিসের দলিল একত্র করলে মোট ছয়টি স্তর পাওয়া যায় যাদের আমরা অনুসরণ করবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা (একক সত্তা), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদিন (আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.), সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন), তাবেঈন (রহিমাহুমুল্লাহ), তাবে-তাবেঈন (রহিমাহুমুল্লাহ)।

নবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা আমার পর আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।" হাদিসটি ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহি. সহীহ বলেছেন। ফজিলতের দিক থেকে উসমান ও আলী (রা.) এর মাঝে কে এগিয়ে এটা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। তবে মর্যাদার দিক থেকে এই চার জনই হবেন শ্রেষ্ঠ। এরপরে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামগণ। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন।

উপরের উল্লেখিত আয়াতে আমরা দেখেছি যে "وَأُولِي الْأَمْرِ" – এর সাথে "أَطِيعُوا" – শব্দটি আনা হয়নি। এক্ষেত্রে আলেমদের অবস্থান হলো 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর অনুসরণ যিনি করবেন তার অনুসরণ করা যাবে তিনি যেই হোন না কেন। তাহলে এখানেও সবচেয়ে প্রথমে থাকছেন আবু বকর, এরপর উমার, এরপর উসমান এবং এরপর আলী (রা.)।

অনুসরণের ক্রম সর্বদা উপর থেকে নিচে আসবে, নিচ থেকে উপরে নয়। সবার আগে দেখতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কী বলেছেন, এরপর আবু বকর, উমর ও উসমান (রাদ্বি.), এরপর সাহাবায়ে কিরাম সবাই, এরপর তাবেঈগণ, এরপর সালাফ পর্যন্ত পৌঁছাব।

মানহাজ: অর্থ ও পরিচয়

'مَنْهَج' (মানহাজ) ও 'مَذْهَب' (মাযহাব)- এই দুটি শব্দের শাব্দিক অর্থ একই অর্থাৎ, পথ বা পদ্ধতি। এই মাযহাব শব্দের উপর একটা কিতাব আছে, 'আত-তামাযহুব হুকমুহু ওয়া হাকিকাতুহু', এটা লিখেছেন হলো আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মদ আশ-শুয়াইইয়ির। এখানে তিনি মাযহাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করছেন। যখন উভয় শব্দ একই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন একই অর্থ বুঝায়। যখন আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় তখন বিশেষ পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে। মানহাজ হলো-

> وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ إِلَى الْحَقِّ
>
> অর্থঃ হক্ব পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি মাধ্যম

হক্ব (কুরআন ও সুন্নাহ) সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন সাহাবাগণ (রা.), এরপর উনাদের ছাত্ররা, এরপর তাঁদের ছাত্ররা। আমভাবে তাবেঈরা না, কেননা খারেজীরাও তো তাবেঈ ছিল। এমনকি ক্বাদরিয়ারা ইবনে উমারের মত সাহাবীদের সোহবত পাওয়া সত্ত্বেও তা তাঁদের কোনো কাজে আসেনি।

কুরআন ও সুন্নাহকে সালাফে সালেহীনগন যেভাবে বুঝেছেন, সেভাবেই সঠিক বোঝাপড়া পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা যে পদ্ধতি বা

মাধ্যম অবলম্বন করি তাই মানহাজ। হক পর্যন্ত পৌঁছানোর অনেক মাধ্যম বা পথ থাকতে পারে। যেমন কুরআনের আল্লাহ তা’আলা বলেছেন –

> وَمَنۡ يُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الۡهُدٰى وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيۡلِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصۡلِهٖ جَهَنَّمَ‌ؕ وَسَآءَتۡ مَصِيۡرًا
>
> অর্থঃ যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু’মিনদের পথসমূহ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস! (সূরা নিসা: ১১৫)

যেমন আব্দুর রহমান নাসির সাদি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর লিখিত কাওয়ায়েদুল হিসান মুতাআল্লিকা বিত্তাফসিরিল কুরআন কিতাবটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কায়দা বলেছেন, “কুরআন ও সুন্নাহর অনুবাদে কোনো শব্দের অর্থ সাহাবারা যেভাবে বুঝেছেন, সেটাকেই রাখতে হবে যদিও অভিধানে বিপরীতটা থাকুক”। এখানে 'سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ' (মুমিনদের পথসমূহ) এ শব্দটি 'মুফরাদ' (একবচন) হলেও 'মুজাফ' (সম্বন্ধপদ) হিসেবে ব্যাপক অর্থ বহন করে। তাই শব্দটির সঠিক অর্থ হবে মুমিনদের পথসমূহ।

কাওয়ায়িদুল হিসানের মধ্যে আব্দুর রহমান নাসির আস-সাদী বলেছেন, 'মুফরাদ মুদাফ ইউফীদুল উমুম'। একক কোনো একটি শব্দ যদি আরবিতে মুযাফ (সম্বন্ধ) হিসেবে আসে, তবে এটা ব্যাপকতার ফায়দা দেয়। অর্থাৎ এই আয়াতটার তরজমা হবে, 'ওয়া মাই ইউশাকিকির রাসূলা মিম বা'দি মা তাবাইয়্যানা লাহুল হুদা', 'ওয়া ইয়াত্তাবি' গাইরা সাবিলিল মু'মিনিন', এবং মুমিনদের পন্থাসমূহ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে। মুমিনদের পন্থাসমূহ অর্থাৎ, এখানে সাবিল দ্বারা একটি পথ না, অসংখ্য পন্থাকে নির্দেশ করে।

তাহলে কুরআন-সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার জন্য অনেকগুলা পথ আছে। যেমন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে কোনো একটা হাদিসের অনেকগুলা ব্যাখ্যা আছে। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই সঠিক। এমনও ব্যাখ্যাও আছে যেখানে প্রত্যেকটি সঠিক, আপনি যেকোনো একটা আমল করতে পারবেন। আবার অনেক ব্যাখ্যা আছে যেগুলো একক মত, সেগুলো অনুসরণ করা যায় না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সূরা ফালাক এবং সূরা নাসকে কুরআনের অংশ মনে করতেন না। কিন্তু জমহুর সাহাবী মনে করতেন। এককভাবে উনি মনে করতেন না। এটা তার ভুল মত ছিল, নিজস্ব ইজতিহাদ ছিল।

মানহাজ হলো 'ওয়াসিলাতুন মিন ওয়াসায়িলি ইলাল হাক্ব'। সালাফরা কুরআন-সুন্নাহকে যেভাবে বুঝেছেন সেটাই সঠিক বুঝ। এতে কোনো সন্দেহ থাকা যাবেনা। সালাফদের বুঝ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যে পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করবো সেটাই হলো মানহাজ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এই দ্বীনকে একজন পাপাচারী (ফাজির) ব্যক্তির মাধ্যমেও শক্তিশালী করতে পারেন। একজন বড় ব্যক্তিত্বকে, একজন সাধারণ মানুষ দ্বারাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা হিদায়াত দিতে পারেন। তবে যদি মাযহাবটা 'ওয়াসিলাতুন মিন ওয়াসায়িলি ইলাল হাক্ব' না হয়, স্বয়ং নিজেকে হক দাবি করে বসে, তাহলে মানহাজও বাতিল হয়ে যাবে।

অনেককে বলতে শোনা যায় যে, আরবি ডিকশনারিতে অমুক আরবি শব্দের অর্থ এটা আছে, অথচ অমুক আলেম এটা বলে, তাই আলেম ভুল। এভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া ভুল পদ্ধতি। সালাফদের থেকে শাব্দিক ব্যাখ্যা যা আসবে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং 'সাবিল' শব্দটি দ্বারা একটি নয়, বরং মুমিনদের অসংখ্য পন্থা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে মানহাজ হলো হক্ব পর্যন্ত পৌছার মাধ্যমসমূহের মাঝে একটি মাধ্যম। এই মাধ্যম হতে পারে বিভিন্ন মাজহাব (হানাফি, শাফেঈ, হাম্বলি, মালিকি), কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা, মাদরাসা ইত্যাদি। একইভাবে ‘হক্ব বুঝার ক্ষেত্রে সালাফদের বুঝ গ্রহন’ – এটা হলো একটা মাধ্যম। উপরে আমরা দেখেছি হক্ব বোঝার জন্য নবী (সা.) থেকে প্রমাণিত হলো সালাফদের পথ/বোঝাপড়া অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া।

মানহাজের উদাহরণসমূহ

- হানাফি মাযহাবের পথে সালাফের বোঝাপড়ায় পৌঁছানো
- হাম্বলি মাযহাবের পথে সালাফের বোঝাপড়ায় পৌঁছানো
- মালেকি বা শাফেঈ মাযহাবের পথে পৌঁছানো
- কোনো নির্দিষ্ট মাদরাসার মাধ্যমে পৌঁছানো
- কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে পৌঁছানো
- কোনো কিতাব বা লেকচারের মাধ্যমে পৌঁছানো

মানহাজ কখন বাতিল হয়?

যদি কেউ নিজের পথ বা মাধ্যমকে একমাত্র সত্য বলে দাবি করে বসে, তখন সেই মানহাজ সালাফদের মানহাজের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। "শুধু হানাফি মাযহাবই সঠিক" এই চিন্তা সালাফি মানহাজের বিপরীত। হানাফি মানহাজ সঠিক, তবে ‘হানাফি মানহাজের অবস্থানকেই হক্ব মনে করা’ এই চিন্তাটা ভুল। "শুধু হাম্বলি মাযহাবই সঠিক" এটাও সালাফি মানহাজের বিপরীত। হাম্বলি মানহাজ সঠিক, তবে ‘হাম্বলি মানহাজের অবস্থানকেই হক্ব মনে করা’ এই চিন্তাটা ভুল। "শুধু আমার এই একজন আলেমের মতই সত্য" এটাও বিপরীত।

মানহাজ হলো মাধ্যম, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো সালাফের বোঝাপড়া পর্যন্ত পৌঁছানো। মাধ্যম অনেক হতে পারে। কেননা এটা দলিল দিয়ে প্রমাণিত। এটা কোনো ব্যক্তি যেভাবেই অর্জন করুক, অর্থাৎ সালাফদের বুঝ পর্যন্ত পৌছার জন্য সে যে মাধ্যমই ব্যবহার করবে তাই সালাফি মানহাজ। ঐতিহাসিকভাবে সালাফদের মানহাজ বিভিন্ন রূপে আমাদের সামনে এসেছে-

- মু’তাযিলাদের বিরুদ্ধে আহমদ ইবনে হাম্বলের অবস্থান

• খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান

• শিয়াদের বিরুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান

• উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান

• খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের অবস্থান

সালাফদের মানহাজ বোঝার পদ্ধতি

আবু মানসুর আল-বাগদাদি 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল- নবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাঁর মৃত্যুকে বিশ্বাস না করা। এমনকি নবী (সা.) এর মৃত্যুতে বিশ্বাস করা সাহাবীরা উমর (রা.) এর ভয়ে সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছিলেন। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। কিন্তু এটি 'ফিরকা' হিসেবে গণ্য হয়নি। কারন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দলিল পেশ করলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং আহলুস সুন্নাহর একটি স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বিষয়টা এমন ছিল না যে উমার (রা.) আবু বকর (রা.) থেকে নবী সাঃ এর সোহবত কম পেয়েছিলেন। না! বরং দুজনই কাছাকাছি সোহবত পেয়েছিলেন। একই বিষয় ঘটেছিল ‘যাকাত অস্বীকারকারীদের’ ফিতনা মোকাবিলায় আবু বকর (রা.)-এর অবস্থান নিয়েও। সাহাবিরা উমার (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন, যেন আবু বকর (রা.) অবস্থান পরিবর্তন করেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে উমার (রা.) হক্বকে বুঝে ছিলেন।

অন্যদিকে ফিরকা হিসেবে খারেজীদের উথান ঘটে সবার প্রথমে। খাওয়ারিজরা কুরআনের আয়াত দিয়েই দলিল দিত। সেই আয়াতের ভিত্তিতেই তারা সাহাবায়ে কেরামদের তাক্বফির করেছিল। খাওয়ারিজরা সাহাবাদের জীবদ্দশায় কুরআন ও হাদিস নিয়ে সাহাবাদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজেদের মত বুঝতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে 'মুফাসসিরদের প্রধান' বলা হয়, তাদের কাছে গিয়ে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ ফিরে আসেনি।

খাওয়ারিজদের সাথে মূল পার্থক্য হলো তারা সাহাবাদের মানহাজে ফিরে আসেনি। নবী (সা.)-এর হাদিস ও সাহাবাদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে বুঝতে চেয়েছিল। এটাই ছিল তাদের মূল সমস্যা।

এর কারণ ছিল তাদের মানহাজগত সমস্যা। তারা নবী (সা.)-এর হাদিসকে তাঁর ছাত্রদের (সাহাবাদের) বুঝ থেকে বাদ দিয়ে বুঝতে চেয়েছিল। এটাই হলো উমার (রা.)-এর ভুল বোঝা আর খাওয়ারিজদের ভুল বোঝার মাঝে পার্থক্য। যদি খাওয়ারিজরা ভুল বোঝার পরেও যদি তাক্বফির করার অবস্থান থেকে ফিরে আসতো তাহলেও সমস্যা ছিল না, কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। যদিও বুঝানোর পরে একটি বড় অংশ ফিরে এসেছিল, তবে যারা ফিরে আসেনি তারাই খারেজী হিসেবে রয়ে যায়।

আবার দেখুন যে, সাহাবীদের জীবদ্দশায়ই অনেক তাবেঈরা ফাতওয়া দিয়েছিলেন যেমন আবু হুরায়রা (রা.)-এর ছাত্র সাঈদ ইবনে

মুসায়্যিব রাহি., মালিক বিন আনাস রাহি. । আবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক বিন আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় অনেক কম বয়সী সাহাবী ছিলেন। রিজালের কিতাবে উল্লেখ আছে, ঐ বয়সে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি তাঁদের ছিল না। বালেগ হবার পর তাঁরা অনুমতি পান। একমাত্র যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সরাসরি ঘরে প্রবেশ করে বায়াত নিয়েছেন তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র, এটা ইবনে কাসিরের মত।

নবী (সা.) এর ওফাতের পর, এই কম বয়সী সাহাবীরাই বেশি ফাতওয়া দিতেন, কিন্তু প্রবীণ সাহাবীরা তখনো জীবিত। হাদিস বর্ণনা বেশি করেছিলেন আবু হুরায়রা (রা.) কিন্তু ফাতওয়ার কিতাব খুললে ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, ইবনে যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)- এর নাম অনেক পাবেন।

একটা বিখ্যাত হাদিস আছে যেখানে, একজন ব্যক্তি মাথায় আহত অবস্থায় জিহাদের সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তার গোসল ফরজ হওয়ার পর সাহাবীরা ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে 'গোসল করতেই হবে।' পরে গোসলের ফলে মাথায় পানি ঢুকে যাওয়ায় ঐ সাহাবী মারা যান। নবী (সা.) এই কাহিনী শুনে বলেছিলেন যে – "তারা (যে সাহাবীরা ফাতওয়া দিয়েছিলেন) জিজ্ঞেস করলো না কেন? কারণ, না জানার চিকিৎসাই হল জানতে চাওয়া।"

এখান থেকে শায়খ ঊসাইমিন রাহি. একটি একটা নুকতা দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তাঁর চেয়ে যোগ্য লোক থাকা অবস্থায় ফাতওয়া দিতে পারবে এবং এটা বৈধ। যেমন নবী (সা.) এর জীবদ্দশাতেই সাহাবীরা ফাতওয়া দিতেন'। আর 'জিজ্ঞেস করলো না কেন? কারণ, না জানার চিকিৎসাই হল জানতে চাওয়া।" এই কথা বলেও নবী সাঃ ফাতওয়া দেয়ার প্রতি তিরস্কার করেননি। বরং সাহাবীরা যে 'বিষয়টা না জেনে' ফাতওয়া দিয়েছেন এটাকে তিরস্কার করেছিলেন।

আবার উসামা ইবনে যায়দ (রা.) যখন একজন নওমুসলিমকে শহীদ করে ফেলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাজটাকে ইনকার করেছেন । তিনি যে ইজতিহাদ করেছেন সেটাকে ইনকার করেননি। এজন্য শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন একজন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্য লোক থাকা অবস্থায় ফাতওয়া দেয়া বৈধ।

বর্তমান সময়ে সালাফি মানহাজে পৌঁছানোর পদ্ধতি

বর্তমান সময়ে সালাফে সালেহীনের মানহাজে পৌঁছানোর সঠিক পদ্ধতি হলো- নিজেদের সময় থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে পূর্বসূরি উলামাদের মাধ্যমে সালাফ পর্যন্ত পৌঁছানো। অর্থাৎ, আমরা মাঝখান থেকে শুরু করব না, আবার সরাসরি কুরআন-হাদিস হাতে নিয়ে সাহাবিদের যুগ থেকে নিজে নিজে বোঝারও চেষ্টা করব না। বরং ইলমের স্বীকৃত ধারাবাহিকতা (Chain of Knowledge) অনুসরণ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হব। এ পদ্ধতিকেই বলা হয় আত-তাদাররুজ (التدرج)—অর্থাৎ ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া।

এটি মূলত "وسيلة من وسائل إلى الحق" সত্যে পৌঁছার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অর্থাৎ, বর্তমান যুগে আমরা আমাদের সময়ের বিশ্বস্ত আলেমদের মাধ্যমে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সালাফে সালেহিনের বুঝ পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করব। এভাবে আমরা নিশ্চিত

হতে পারব যে, কোনো বিষয়ে যে মত বা ব্যাখ্যা গ্রহণ করছি, তা সালাফদের উসূল ও মানহাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারাবাহিকতার ক্রমসমূহ-

প্রথম ধাপ: সমসাময়িক বিশ্বস্ত উলামায়ে কিরামের মতামত জানা। যেমন: শাইখ ইবনে বায, শাইখ ইবনু উসাইমীন, আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি, আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি, তারেক আব্দুল হালিম, হানি আস-সিবাঈ, সামি আল-উরাইদি এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত আলেম।

দ্বিতীয় ধাপ: তাঁদের পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা। যেমন: শাইখ আব্দুর রহমান নাসির আস-সা'দী, আশ-শানকিতি এবং অন্যান্য সমকালীন মুহাক্কিক আলেম।

তৃতীয় ধাপ: আরও পূর্ববর্তী ইমাম ও মুহাক্কিক আলেমদের মতামত জানা। যেমন: মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও তাঁর সমসাময়িক আলেমগণ; এরপর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে কাসীর, ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ।

চতুর্থ ধাপ: এভাবে ধারাবাহিকভাবে সালাফে সালেহীনের বোঝাপড়া পর্যন্ত পৌঁছানো।

এই ধারাবাহিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছাত্রদের চেইন সংরক্ষণ ও অনুসরণের উপদেশ দিয়েছিলেন। তাবেঈ ইমাম ইবনে সিরীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন-"নিশ্চয়ই এই ইলমই হলো দ্বীন। অতএব, তোমরা লক্ষ্য করো কার কাছ থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।"

এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ আমরা হাদিসশাস্ত্রেও দেখতে পাই। যদি কোনো তাবেঈ সাহাবির নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ⍰ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তবে সেই বর্ণনাকে মুরসাল হাদিস বলা হয়। মুরসাল হাদিস যঈফের একটি প্রকার। কারণ, যদিও তাবেঈ ও রাসূলুল্লাহ ⍰ উভয়ই নির্ভরযোগ্য, তবুও সনদের মাঝখানে সাহাবির অনুপস্থিতির কারণে চেইনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

এ কারণেই ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহিমাহুল্লাহ)-কে كَثْرَةُ الْإِرْسَالِ (কাসরাতুল ইরসাল) বলা হতো। তিনি অনেক মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদিসের অধিকাংশের মতন (বিষয়বস্তু) সহীহ হলেও সনদের বিচ্ছিন্নতার কারণে সেগুলো যঈফ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঠিক একইভাবে, বর্তমান যুগে কোনো সমসাময়িক আলেমের একটি বক্তব্য শুনেই তা গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং তাহকিক করতে হবে—তাঁর পূর্ববর্তী আলেমরা এ বিষয়ে কী বলেছেন এবং সেই মতামত সালাফে সালেহিনের বোঝাপড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। এভাবে ধারাবাহিক ইলমি চেইন অনুসরণ করে সালাফের বুঝ পর্যন্ত পৌঁছানোই নিরাপদ পদ্ধতি।

এ কারণেই বর্তমান সময়ে বিশ্বস্ত সমসাময়িক আলেমদের অনুসরণের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর অর্থ অন্ধ অনুসরণ নয়; বরং তাঁদেরকে সূচনা বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে তাঁদের পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্য যাচাই করতে করতে শেষ পর্যন্ত সালাফে সালেহীনের বুঝ পর্যন্ত পৌঁছানো। এটাই বর্তমান যুগে সালাফদের উসূল ও মানহাজে পৌঁছার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও নিরাপদ

পদ্ধতি।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সালাফদের মানহাজে পৌঁছার এটি একমাত্র উপায় নয়; বরং সত্যে পৌঁছার অন্যতম একটি মাধ্যম। কোনো যোগ্য আলেম অন্য উপায়েও সত্যে পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মুসলিম ও তালিবুল ইলমের জন্য এই ধারাবাহিক পদ্ধতিই অধিক নিরাপদ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন—

• কোনো একজন আলেমের একটি বক্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের আলোচনা উপেক্ষা করা সালাফি মানহাজ নয়।

• কোনো সমসাময়িক আলেমের বক্তব্য শুনেই যাচাই-বাছাই ছাড়া অনুসরণ শুরু করা সঠিক পদ্ধতি নয়।

• কুরআন-হাদিস সরাসরি পড়ে সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজস্ব বোঝাপড়ার ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক পথ।

• কোনো একটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা মাধ্যমকেই একমাত্র সত্যের মানদণ্ড মনে করা সালাফি মানহাজের পরিপন্থী।

• ইলমের ধারাবাহিক চেইন অক্ষুণ্ন রাখা সালাফি মানহাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব, যদি তোমরা না জানো, তবে আহলুয যিকর (জ্ঞানীদের) কাছে জিজ্ঞাসা করো।"

এই আয়াতের আলোকে উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সালাফে সালেহীনের বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর চেষ্টা করাই নিরাপদ পথ। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করা হয়। কিন্তু যথাযথ যোগ্যতা ছাড়া নিজে নিজে ইজতিহাদ বা স্বাধীনভাবে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গেলে তার দায়ভার নিজের ওপরই বর্তাবে এবং সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

অতএব, আমাদের করণীয় হলো- ইলমের এই বরকতময় চেইন সংরক্ষণ করা এবং নিজেদের সময় থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সালাফে সালেহীনের বোঝাপড়া পর্যন্ত পৌঁছানো। আমরা এদিক থেকেই শুরু করব; মাঝখান থেকে নয়, কিংবা সরাসরি অতীতের কোনো স্তর থেকে নয়। ইন শা আল্লাহ, এভাবেই আমরা নিরাপদ ও সঠিক মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারব।

খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসরণের সঠিক অর্থ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেমন তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ»

"তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে।"

অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মূলত তাঁর এবং তাঁর রাসূলেরই অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে—যদি অনুসরণ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই হয়, তবে খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের অর্থ কী? তাঁদের অনুসরণ কি স্বতন্ত্রভাবে ফরজ, নাকি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণেরই একটি অংশ? এই প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল-খিলাফাহ ওয়াল-মুলক" গ্রন্থটিতে।

ইমাম আবুল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) "শারহুল আকীদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন-"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষের জন্য যে বিধান, পদ্ধতি বা আদর্শ প্রবর্তন করেছেন, সেটাই সুন্নাহ।"

এ সংজ্ঞা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি ব্যক্তিগত কাজ সুন্নাহ নয়। কারণ, তাঁর কিছু কাজ ছিল মানবীয় স্বভাব, অভ্যাস বা ব্যক্তিগত জীবনের অংশ, যা উম্মতের জন্য বিধান হিসেবে প্রবর্তিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিকেলের সময় তাঁর স্ত্রীদের খোঁজখবর নিতে যেতেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত ও বৈধ (মুবাহ) একটি আমল। এটিকে উম্মতের জন্য শারঈ সুন্নাহ মনে করা সঠিক নয়। বরং সুন্নাহ হলো সেই কাজ, শিক্ষা ও নির্দেশনা, যা তিনি উম্মতের জন্য দ্বীনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইবনু উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল" গ্রন্থেও এ বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত মুবাহ কাজ ও শারঈ সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। শাইখ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় পৃথকভাবে বুঝতে হবে— ১. আস-সুন্নাহ (السنة) ও ২. আল-কুদওয়া (القدوة)

আস-সুন্নাহ: ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, খুলাফায়ে রাশেদীনের যে বিষয়টি সম্মিলিতভাবে চারজন খলিফা—আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)—অবলম্বন করেছেন, সেটিই তাঁদের সুন্নাহ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে যে "খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ" অনুসরণের কথা এসেছে, তা মূলত এই সম্মিলিত নীতি ও পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে।

শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, চারজন খলিফার জীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়—তাঁদের সকলের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংরক্ষণ এবং বিভক্তি প্রতিরোধ। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ইজতিহাদ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল এক—উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং ফিতনা থেকে রক্ষা করা। এটাই তাঁদের সুন্নাহ।

আল-কুদওয়া: অন্যদিকে, কোনো একজন খলিফার একক ইজতিহাদ, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গৃহীত পদক্ষেপকে ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) "কুদওয়া" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এ ধরনের কাজ সম্মান ও অনুসরণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু নবী ?-এর হাদিসে যে "খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ" অনুসরণের নির্দেশ এসেছে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি একক ইজতিহাদকে অন্তর্ভুক্ত করে—এমনটি বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জুমার পূর্বে অতিরিক্ত একটি আযান চালু করেছিলেন। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনার আলোকে এটিকে "কুদওয়া"র উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়; অর্থাৎ এটি একজন খলিফার নির্দিষ্ট ইজতিহাদ ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, চার খলিফার সম্মিলিত সুন্নাহ নয়।

সুতরাং, খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেক ব্যক্তিগত ইজতিহাদ এবং তাঁদের সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। এই পার্থক্য বুঝতে পারলে নবী ?-এর "আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করো"—এই নির্দেশের প্রকৃত অর্থ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনার আলোকে "সুন্নাহ" ও "কুদওয়া"র পার্থক্য অনুধাবন করলে খুলাফায়ে রাশেদীনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। অন্যথায় তাঁদের কোনো একক ইজতিহাদকে সর্বজনীন সুন্নাহ মনে করার মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উদাহরনস্বরূপ:

১। উসমান (রা.)-এর ক্ষমতা ত্যাগ না করার ঘটনা: উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের শেষ পর্যায়ে বিদ্রোহীরা তাঁর কাছে খেলাফত ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করেননি। এ ঘটনা থেকে কেউ যদি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, একবার শাসকের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হলে কোনো অবস্থাতেই তা ত্যাগ করা বৈধ নয়, এবং এটিই খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, তবে ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনার ভিত্তিতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। কারণ, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ক্ষমতায় অবিচল ছিলেন মূলত রাসূলুল্লাহ ?-এর একটি নির্দেশনার কারণে। অর্থাৎ, তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল নববী নির্দেশ; ক্ষমতায় অবিচল থাকাকে একটি স্বতন্ত্র সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ সিদ্ধান্তকে সর্বকালের জন্য একটি সাধারণ শারঈ নীতি হিসেবে উপস্থাপন করা কিংবা এটিকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ বলে দাবি করা যথার্থ নয়। বরং এটি তাঁর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গৃহীত একটি ইজতিহাদ ও অবস্থান, যা "কুদওয়া"র অন্তর্ভুক্ত।

২। আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধ: একইভাবে আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যকার সংঘর্ষ থেকেও একটি সর্বজনীন নীতি উদ্ভাবন করা সঠিক নয়। শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এ যুদ্ধ থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না যে, কোনো দল বায়আত না দিলে বা শাসকের বিরোধিতা করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ। বরং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে গৃহীত। ইজতিহাদ সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে; তবে ইজতিহাদকে সুন্নাহ বলা হয় না। এ কারণেই এ ঘটনাকে "কুদওয়া"র অন্তর্ভুক্ত বলা হয়, "সুন্নাহ"র নয়। এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইতিহাসের নির্দিষ্ট

ঘটনাকে সর্বজনীন শরয়ি বিধান হিসেবে উপস্থাপন করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

৩। খারিজিদের ভুল পদ্ধতি

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন যে, খারিজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ বিধান হিসেবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করত। তাঁদের ধারণা ছিল, যারা বৈধ ইমামের বায়আত গ্রহণ করবে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শারঈভাবে আবশ্যক। তারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময়কার ঘটনাকে এ দাবির সমর্থনে ব্যবহার করার চেষ্টা করত। কিন্তু ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা এবং শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইজতিহাদ থেকে এ ধরনের সাধারণ বিধান প্রমাণিত হয় না। কারণ, এটি ছিল একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে গৃহীত সিদ্ধান্ত; নবী ? নির্দেশিত অনুসরণীয় "সুন্নাহ" নয়।

চার খলিফার সম্মিলিত সুন্নাহ: চারজন খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের পদ্ধতি ও ইজতিহাদে ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত ছিলেন—মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষা। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রিদ্দাহর সংকট মোকাবিলার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর শাসনামলে মুসলিম সমাজের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর অন্যতম উদ্বেগ ছিল, তাঁর শাহাদাতের পর মুসলিমদের মধ্যে যেন বিভক্তি সৃষ্টি না হয়। উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের জীবন বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও উম্মাহকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চাননি। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদের লক্ষ্যও ছিল উম্মাহর কল্যাণ এবং বিভক্তি দূর করা। শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই ধারাবাহিকতা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সম্মিলিত সুন্নাহ ছিল মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংরক্ষণ, বিভেদ হ্রাস এবং জামাআতের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা।

অতএব, তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ নয়; বরং যে নীতির ওপর চারজনই একমত ছিলেন এবং যা তাঁদের শাসনপদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেটিই নবী ?-এর নির্দেশিত "খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ"র প্রকৃত তাৎপর্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই পার্থক্য অনুধাবন করা মানহাজগত আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর মাধ্যমে বোঝা যায়—ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা অনুসরণীয় সুন্নাহ নয়; বরং যে নীতি ও পদ্ধতির ওপর খুলাফায়ে রাশেদীন সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অনুসরণের নির্দেশ মূলত তারই প্রতি।

সুন্নাহ ও কুদওয়ার পার্থক্য অনুধাবনের গুরুত্ব

সুন্নাহ ও কুদওয়ার পার্থক্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা মানহাজগত আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পার্থক্য স্পষ্ট না হলে অনেক সময় কোনো সাহাবীর ব্যক্তিগত ইজতিহাদকে শরিয়তের সর্বজনীন বিধান মনে করা হয় অথবা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তা প্রত্যেক যুগ ও পরিস্থিতিতে অনুসরণ করা আবশ্যক। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনার সারমর্ম অনুযায়ী, খুলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের বিষয় বিদ্যমান।

প্রথমটি হলো তাঁদের সম্মিলিত সুন্নাহ—যে নীতি ও পদ্ধতির ওপর চারজন খলিফাই একমত ছিলেন এবং যা তাঁদের শাসন, নেতৃত্ব ও দ্বীনের বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নবী ﷺ-এর নির্দেশে যে "খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ" অনুসরণের কথা এসেছে, তা মূলত এ অর্থেই বোঝা হয়।

দ্বিতীয়টি হলো তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, যা নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও পরিস্থিতির আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত। এগুলো তাঁদের মর্যাদা, ইলম ও তাকওয়ার সাক্ষ্য বহন করে এবং সম্মানের সঙ্গে অধ্যয়ন ও মূল্যায়নের যোগ্য। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিগত ইজতিহাদকে সর্বজনীন সুন্নাহ হিসেবে গণ্য করা বা সব যুগের মুসলিমদের জন্য অনুসরণ বাধ্যতামূলক মনে করা সঠিক নয়।

এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মূল্যায়ন করা সহজ হয় এবং ইতিহাস থেকে শরয়ি বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় থাকে।

শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, চারজন খুলাফার জীবন পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সর্বাধিক সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তা হলো—মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংরক্ষণ। তাঁদের ইজতিহাদে পার্থক্য ছিল তবে সকলেই ফিতনা হ্রাস, জামাআতের ঐক্য এবং মুসলিম সমাজের সংহতি বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি উম্মতের ঐক্যকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সম্মিলিত সুন্নাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, আমাদের জন্য শিক্ষা হলো—কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা একক ইজতিহাদকে কেন্দ্র করে মানহাজ নির্মাণ করা নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের সম্মিলিত উসূল ও পদ্ধতির আলোকে বিষয়গুলো অনুধাবন করা। এতে একদিকে যেমন চরমপন্থা ও বিদআতের আশঙ্কা হ্রাস পায়, অন্যদিকে দ্বীনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও ভারসাম্যও সংরক্ষিত থাকে।

সবশেষে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহই হলো মূল ভিত্তি। আর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ হলো সেই ভিত্তিরই বাস্তব প্রয়োগ, যা তাঁরা সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পক্ষান্তরে, তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ "কুদওয়া" হিসেবে সম্মানিত হলেও সেগুলোকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক সুন্নাহ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।

অতএব, মানহাজের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো—কুরআন ও সুন্নাহকে সালাফে সালেহীনের সম্মিলিত বোঝাপড়ার আলোকে গ্রহণ করা, খুলাফায়ে রাশেদীনের সম্মিলিত সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মূল্যায়ন করা। ইন শা আল্লাহ, এ পদ্ধতিই আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরাপদ মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহায়তা করবে।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এবং ৭৩ ফিরকা

'ফিরকা' শব্দটি কুরআন ও হাদিসে ইতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾

এখানে ‘ফিরকা’ শব্দটি একটি দলের অর্থে ইতিবাচকভাবেই এসেছে। একইভাবে হাদিসেও ‘আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ’ (নাজাতপ্রাপ্ত দল) বলতে উত্তম অর্থই বোঝানো হয়েছে। তবে পরবর্তী যুগে উলামাদের পরিভাষায় ‘ফিরকা’ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত দল বা বিচ্যুত গোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি ছাড়া সবগুলো জাহান্নামে যাবে।" অন্য বর্ণনায় নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয় এসেছে—

«مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»

অর্থাৎ, যারা আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথের উপর আছি, সেই পথ অনুসরণ করবে। এই হাদিসটি মুতাওয়াতির মাআনাওয়ি; অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণনার সমষ্টিগত অর্থ এত বেশি শক্তিশালী যে অর্থগতভাবে এটি মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। সুতরাং নাজাতপ্রাপ্ত দল হলো সেই দল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালিহীনের আকিদা ও মানহাজ অনুসরণ করবে।

এ প্রসঙ্গে আবু মানসুর আল-বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক’-এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে তিনি ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’-এর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হলো সেই দল, যারা উসূলুদ্দীন (আকিদা)-এর ক্ষেত্রে ঐকমত্যে উপনীত, কিন্তু শাখাগত ও ইজতিহাদি বিষয়গুলোতে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে গোমরাহ, ফাসিক বা জামাআত থেকে বহিষ্কৃত বলে না।

এখানেই ৭৩ ফিরকার হাদিসটি বুঝতে হবে। অনেকেই মনে করেন, আহলুস সুন্নাহর ভেতরে যে বিভিন্ন ধারা বা মাযহাব রয়েছে, এগুলোই যেন আলাদা আলাদা ফিরকা। বাস্তবে বিষয়টি তা নয়। কারণ শুধু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মধ্যেই বহু ধারা ও মাযহাব বিদ্যমান। যেমন—

• সালাফি ধারা

• আসারি ধারা

• যাহিরি ধারা

• হানাফি মাযহাব

• মালেকি মাযহাব

• শাফেয়ি মাযহাব

• হাম্বলি মাযহাব

• সুফিয়ান আস-সাওরীর মাযহাব

• লাইস ইবনে সাদ রহিমাহুল্লাহর মাযহাব (যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে যায়) ইত্যাদি।

এছাড়া সালাফি ধারার মধ্যেও বিভিন্ন ইজতিহাদি প্রবণতা বিদ্যমান। যেমন সালাফি, আসারি ও যাহিরি এই তিনটি ধারার মধ্যে আকিদা ও অধিকাংশ ফিকহি উসূলে ব্যাপক মিল রয়েছে; কেবল অল্প কিছু ইজতিহাদি পার্থক্য বিদ্যমান। ফলে এসব পার্থক্য কাউকে আহলুস সুন্নাহর বাইরে নিয়ে যায় না। মূল বিষয় হলো, উসূলুদ্দীনে সবাই একমত, কিন্তু শাখাগত ইজতিহাদে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

• সালাতে হাত বাঁধার স্থান।

• আমীন আস্তে না জোরে বলা।

• কিছু ফিকহি মাসআলায় দলিলের প্রয়োগের ভিন্নতা।

• কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণকে অন্যটির তুলনায় প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতি।

এসবই ইজতিহাদি মতভেদ; আকিদাগত মতভেদ নয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের যুগেও এ ধরনের মতভেদ ছিল। একজন তাবেয়ী যে সাহাবীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, সাধারণত তাঁর ফতোয়াকেই অনুসরণ করতেন। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহিমাহুল্লাহ, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ছিলেন; তাই তাঁর ফিকহি মতামত অধিক গ্রহণ করতেন। আবার আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ছাত্ররা তাঁর ফতোয়া অনুসরণ করতেন। এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা অন্য সাহাবিদের ভুল মনে করতেন; বরং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে একজন আলেমের মতকে অনুসরণ করতেন।

এ কারণেই কুরআনের ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ আয়াতে ‘সাবীল’ (পথ) শব্দটি এমন একটি পথকে বোঝায়, যার মৌলিক ভিত্তি এক হলেও ইজতিহাদি পর্যায়ে একাধিক সঠিক পদ্ধতি থাকতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহীনও বাস্তবে এভাবেই আমল করেছেন।

সুতরাং ৭৩ ফিরকার হাদিসের উদ্দেশ্য আহলুস সুন্নাহর অভ্যন্তরীণ ইজতিহাদি মতভেদ নয়; বরং সেই সব দল, যারা উসূলুদ্দীনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ?, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহীনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বৈশিষ্ট্য হলো—তারা উসূলুদ্দীনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু শাখাগত ও ইজতিহাদি বিষয়ে মতভেদকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য মনে করে। তাই ইজতিহাদি মতভেদের কারণে তারা একে অপরকে গোমরাহ, ফাসিক বা কাফির বলে না; বরং দলিলের আলোকে ভুলের সংশোধন করে এবং ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।

এ নীতির বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ রহিমাহুল্লাহর মধ্যে। উভয়েই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর শ্রেষ্ঠ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথচ বহু ফিকহি ও উসূলি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল এবং তাঁরা একে অপরের মতামতের সমালোচনা ও খণ্ডনও করেছেন। কিন্তু কখনোই একজন অপরজনকে গোমরাহ, বিদআতি বা আহলুস

সুন্নাহর বাইরে বলে আখ্যায়িত করেননি।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ তাঁর ফিকহি উসূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে 'আমালু আহলিল মাদীনাহ' (মদিনাবাসীর আমল)-কে গ্রহণ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মদিনাবাসীর ধারাবাহিক আমলকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। অপরদিকে ইমাম লাইস ইবনে সাদ রহিমাহুল্লাহ এই উসূলের কিছু প্রয়োগের সমালোচনা করেছেন এবং দলিলের আলোকে ভিন্ন মত পেশ করেছেন।

এই সমালোচনা কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না; বরং সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ইলমি ইজতিহাদ ছিল। বরং বলা যায়, এ ধরনের পারস্পরিক পর্যালোচনার মাধ্যমেই ইসলামী ফিকহ আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। যদি কোনো ইমামের মতামত কখনো পর্যালোচিত না হতো, তাহলে কিছু ভুল ইজতিহাদ পরবর্তী যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারত। তাই আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ একে অপরের মতামত যাচাই করেছেন, সংশোধন করেছেন এবং প্রয়োজনে খণ্ডনও করেছেন; কিন্তু কখনো ব্যক্তিগত মর্যাদাহানি করেননি।

লাইস ইবনে সা'দ রহিমাহুল্লাহর নিজস্ব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাযহাব ছিল, বিশেষত মিসরে। পরবর্তীকালে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবুও তিনি আহলুস সুন্নাহর অন্যতম প্রধান ফকিহ হিসেবে স্বীকৃত। একইভাবে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহও আহলুস সুন্নাহর অন্যতম ইমাম। দুইজনের মতভেদ তাঁদের কাউকেই আহলুস সুন্নাহর বাইরে নিয়ে যায়নি। এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্পষ্ট হয় ব্যক্তি নয় বরং ভুল ইজতিহাদের খণ্ডন করা হবে। অতএব, আহলুস সুন্নাহর কোনো আলেমের ইজতিহাদি ভুল হলে—

• ভুল মতটির খণ্ডন করা হবে।

• দলিলের মাধ্যমে সঠিক মত ব্যাখ্যা করা হবে।

• আলেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

• তাঁকে গোমরাহ, ফাসিক বা আহলুস সুন্নাহর বাইরে বলা হবে না।

কারণ শরিয়তে ইজতিহাদের নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দুটি সওয়াব পান, আর ভুল করলেও একটি সওয়াব পান। অর্থাৎ ভুল ইজতিহাদও সম্পূর্ণ মূল্যহীন নয়; বরং আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দেন। অতএব, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইজতিহাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেখানে আমাদের সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তিকে নিন্দা বা আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কার করার অধিকার নেই। এখানেই আহলুস সুন্নাহ ও ভ্রান্ত ফিরকার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়।

আহলুস সুন্নাহর অভ্যন্তরে মতভেদ হয় 'ওয়াসীলাতুন মিন ওয়াসায়িলি ইলাল হক্ব'—অর্থাৎ হকের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতি, ইজতিহাদ ও ফিকহি প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কেউ সমসাময়িক আলেমদের গবেষণাকে বেশি গুরুত্ব দেন, কেউ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বা অন্যান্য সালাফি ইমামদের বক্তব্যকে অধিক অনুসরণ করেন। এগুলো মানহাজগত বা ইজতিহাদি পার্থক্য হতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উসূলুদ্দীনে ঐক্য অটুট থাকে, ততক্ষণ এসব কারণে কাউকে ভ্রান্ত ফিরকা বলা যায় না।

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ভেতরে অসংখ্য ফিকহি মত, ইজতিহাদি ধারা কিংবা মানহাজগত পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু এগুলো ৭৩ ফিরকার হাদিসে বর্ণিত ভ্রান্ত ফিরকার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতভেদের কেন্দ্রবিন্দু আকিদা নয়; বরং ইজতিহাদ।

এখন প্রশ্ন হলো, ৭৩ ফিরকার হাদিসে ভ্রান্ত ফিরকা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? এর উত্তর হলো—যারা উসূলুদ্দীনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিরোধিতা করে। পক্ষান্তরে, যারা উসূলুদ্দীনে আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে একমত, কিন্তু শাখাগত বা ইজতিহাদি বিষয়ে মতভেদ রাখে, তারা ভ্রান্ত ফিরকার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মধ্যে বহু মাযহাব, বহু ফিকহি ধারা এবং বিভিন্ন ইজতিহাদি প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তারা একই জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের ঐক্যের ভিত্তি হলো উসূলুদ্দীন বা আকিদা।

আবু মানসুর আল-বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এ নীতিই স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সদস্যরা উসূলুদ্দীনে একমত থাকেন; আর শাখাগত ইজতিহাদি মতভেদের কারণে তাঁরা একে অপরকে গোমরাহ, ফাসিক বা জামাআতচ্যুত মনে করেন না। আবার গ্রন্থের শেষাংশে তিনি 'আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ' শিরোনামে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা পৃথকভাবে সংকলন করেছেন।

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কখন কোনো দলকে ভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে গণ্য করবে? উত্তর হলো যখন তারা উসূলুদ্দীনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করবে, যদিও শাখাগত অনেক বিষয়ে তাদের সঙ্গে মিল থাকতে পারে।

এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ কাদিয়ানীরা। তারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারে, ইসলামের অনেক বাহ্যিক আমলও পালন করতে পারে; কিন্তু যেহেতু তারা উসূলুদ্দীনের একটি মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করেছে, তাই তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। একইভাবে মুরজিয়াদের ক্ষেত্রেও মূল বিচ্যুতি আকিদাগত উসূলের মধ্যে; শাখাগত কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও সে কারণে তারা আহলুস সুন্নাহ হয়ে যায় না।

অন্যদিকে, একজন হানাফি ও একজন আহলে হাদিসের মধ্যে ফিকহি মতভেদ এতটাই গভীর হতে পারে যে একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে তারা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎস থেকে দলিল গ্রহণ করছেন। অথচ বাস্তবে উভয়েই কুরআন, সুন্নাহ এবং শরিয়তের দলিল থেকেই ইস্তিদলাল করেন। পার্থক্য হয় দলিল বুঝার পদ্ধতি, দলিলের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে। এই মতভেদ তাদের কাউকেই আহলুস সুন্নাহর বাইরে নিয়ে যায় না; কারণ উভয়েই উসূলুদ্দীনে একমত।

এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বৈশিষ্ট্য। তারা জানে, ইজতিহাদি ভুল হতে পারে। তাই তারা ভুল মতের সংশোধন করে, কিন্তু ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করে না। তাকফির, তাফসিক বা তাবদী'র মতো গুরুতর বিধান কেবল ইজতিহাদি মতভেদের ভিত্তিতে প্রয়োগ করে না।

অতএব, ৭৩ ফিরকার হাদিসকে বুঝতে হলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর এই মূলনীতি মনে রাখতে হবে—

- উসূলুদ্দীনে ঐক্যই আহলুস সুন্নাহর পরিচয়।

- শাখাগত ও ইজতিহাদি মতভেদ স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য।

- ইজতিহাদি ভুলের কারণে কাউকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।

- ভুল মতের খণ্ডন করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

- যে দল উসূলুদ্দীনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করবে, তারাই ভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে গণ্য হবে।

সুতরাং ৭৩ ফিরকার হাদিসের উদ্দেশ্য আহলুস সুন্নাহর অভ্যন্তরীণ ফিকহি মতভেদকে নিন্দা করা নয়; বরং আকিদাগত বিচ্যুতি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করা। আর এ কারণেই একজন মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দুটি সওয়াব এবং ভুল করলেও একটি সওয়াব লাভ করেন। ইজতিহাদের এই মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করেছেন। তাই ইজতিহাদি মতভেদের কারণে ব্যক্তিকে অবমূল্যায়ন না করে, তাঁর ভুল মতকে দলিলের আলোকে সংশোধন করাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর নীতি।